বিশ্ব উন্নয়ন সংস্থা ও বাংলাদেশের উন্নয়ন সমস্যা

আশরাফ আলী

(১) অবতারণা

অর্থনৈতিক বাজারের বখরা প্রতিরক্ষা করা একটি মারাত্মকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, কারণ এর মাধ্যমে জনগণের জীবনযাত্রার মান এবং অর্থনীতির গোটা স্বাস্থ্য প্রভাবিত হয়। শিল্পোন্নত দেশগুলি বাজার প্রতিরক্ষার জন্য নানা ধরণের পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকে। এর একটি হলো আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা। প্রতিষ্ঠানগুলি আন্তর্জাতিক উন্নয়নে আদৌ আগ্রহী নয়, বরং এদের মূল দায়িত্ব হলো স্বদেশী শিল্পকে বিদেশী প্রতিযোগিতার হাত থেকে রক্ষার কৌশল উদ্ভাবন ও নিয়োগ করা। উন্নয়নশীল দেশে সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী উদ্ভব প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে এই আন্তর্জাতিক উন্নয়ন ও অর্থ-সংস্থানকারী প্রতিষ্ঠানগুলি (ইউ-এস-এ-আই-ডি, সি-আই-ডি-এ, এস-আই-ডি-এ, ডব্লিউ-বি, আই-এম-এফ, ইত্যাদি) সচরাচর তিনটি কৌশল অবলম্বন করে বলে ধরে নেওয়া যায়। আমরা আজ দেখবো এই কৌশলগুলি কি কি এবং এগুলি কিভাবে কাজ করে।

(২) প্রথম কৌশল

উন্নয়ন সংস্থাগুলি উন্নয়নশীল দেশের স্থানীয় বুদ্ধিজীবীদের গুরুত্বহীন তুচ্ছ কাজে জড়িয়ে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করে। এই কাজগুলি আপাতঃদৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হতে পারে। আমি নিজেই ১৯৮০-৮১ সনে ইউ-এস-এ-আই-ডি এর টাকায় চালিত এই ধরণের একটি প্রকল্পের সাথে জড়িত ছিলাম। প্রকল্পটি ছিলো - দঁড়ি, কোদাল, কাঠি এবং বাঁশের ঝুড়ির মতো দেশজ হাতিয়া ব্যবহার করে কিভাবে কাঁচা রাস্তা ও পানি-নিষ্কাশন খাল নির্মাণ করা যায়, কিভাবে মজা পুকুর সাফ করা যায়, ইত্যাদির উপর ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় নিয়মাবলী বই প্রস্তুত করা। এই কাজে বাংলাদেশ প্রকৌশল ও কারিগরী বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরকৌশল ও পানিকৌশল বিভাগের অধিকাংশ অধ্যাপক ও প্রভাষক সে-সময় প্রায় এক বছরেরও বেশী সময় ধরে ব্যস্ত ছিলেন।

স্থানীয় ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তারা স্বদেশে শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা না করে শিল্পোন্নত দেশকর্তৃক নির্মিত ও সরবরাহকৃত উচ্চমূল্যের পণ্য বেচাকেনা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। ঠিক একই ভাবে, স্থানীয় বুদ্ধিজীবীরা শিল্পোন্নত দেশের উন্নয়ন সংস্থাকর্তৃক আয়োজিত ও চালিত গবেষণাকাজ নিয়ে ব্যাপৃত থাকেন। ফলে তাঁরা জাতীয় উন্নয়নের নীতিনির্ধারণ করার সময় বা সুযোগ পাচ্ছেন না। স্থানীয় বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের নিয়মিত চাকুরী থেকে যে-টাকা আয় করেন বিদেশী সংস্থাগুলি তার তুলনায় সাধারণতঃ অনেক বেশী হারে মজুরী দেয়। বাস্তবপক্ষে, তাঁরা এইসব কাজ থেকে দূরে সরে থাকতে পারবেন না।

(৩) দ্বিতীয় কৌশল

উন্নত দেশগুলি প্রধানতঃ দুটি কাজ করিয়ে নেবার জন্য এনজিও-র মতো বেসরকারী সংস্থাকে নিয়োগ করে : (১) পুঁজিকে বিক্ষিপ্ত করা, অন্য কথায়, পুঁজির অর্থপূর্ণ সঞ্চয়ের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করা - যার ফলে দেশে প্রযুক্তিগত প্রগতি নিশ্চল হয়ে থাকে এবং (২) যেসব শিল্পোন্নত দেশের উন্নয়ন সংস্থা এনজিও-দের অর্থ যোগান দেয় সেসব দেশ থেকে আমদানী করা যেতে পারে এমন সব উচ্চমূল্য পণ্যের কার্যকরী চাহিদা সৃষ্টি করা। বর্তমানে

হাজারো এনজিও বাংলাদেশে কর্মরত রয়েছে। এনজিও-দের কার্যক্রম রাজধানী শহর থেকে সুদূর পল্লীগ্রামে তৃণমূল পর্যায়ে বিস্তৃত রয়েছে এবং তা দেশের জনগোষ্ঠীর উপর ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি করছে। একথা বহুলভাবে বিদিত যে, বিভিন্ন পেশাজীবী মহলে এনজিও-দের কার্যকলাপের ''স্বচ্ছতা'' ও ''দায়বদ্ধতার অভাব'' নিয়ে প্রশ্ন রয়ে গ্যাছে।

এনজিও-দের কার্যকলাপ বুঝবার জন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ বাংলাদেশের তাঁতশিল্পের কথা ধরুন। বাংলাদেশের কিছু এনজিও গার্হস্থ্য পর্যায়ে তাঁতযন্ত্র মালিকদের ক্ষুদ্র ঋণ ও অন্যান্য সাহায্য দিয়ে থাকে। বোঝা যায়, তাঁতযন্ত্র মালিকদের বিচ্ছিন্ন অবস্থায়,অর্থাৎ সংগঠিত হওয়া থেকে বিরত রাখার জন্য একাজ করা হচ্ছে যাতে তাদের অগ্রগতির চাকা নিশ্চল থেকে যায় এবং তারা মান্ধাতা আমলের পুরোনো প্রযুক্তি ব্যবহার অব্যাহত রাখে। এই মালিকগণ দিন-আনে-দিন-খায় প্রকৃতির তাঁতী। প্রত্যেকে একটি বা দুটি তাঁতযন্ত্রের মালিক।

এনজিও-গুলি তাদের কার্যক্রম নির্ভুল প্রমাণ করার জন্য অনেক সময় একটি তাত্ত্বিক যুক্তি খাঁড়া করে। তাঁতের ক্ষেত্রে তারা গার্হস্থ্য পর্যায়ে তথাকথিত পুঁজি সঞ্চয়নের তত্ত্বটি পরীক্ষা করছে বলে যুক্তি দেয়। রিপোর্ট থেকে জানা যায়, এই প্রকল্পে যোগদানকারী একজন সাধারণ ও সফল গৃহস্ত তাঁতী তার সংসারের খরচপাতি বহন করার পর ৩ থেকে ৫ বছরে মাত্র ৪/৫ মার্কিন ডলার সঞ্চয় করতে পেরেছে! তবে এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এনজিও ও তাদের বিদেশী অর্থ-সংস্থানকারী প্রতিষ্ঠানগুলি গৃহস্ত তাঁতীদের 'বিচ্ছিন্ন' রাখতে সফল হয়েছে, অর্থাৎ তারা অর্থপূর্ণ পুঁজি-সঞ্চয়ন থামিয়ে রেখেছে এবং তার ফলে প্রযুক্তিগত প্রগতি রুদ্ধ করে রাখতে সক্ষম হয়েছে।

প্রযুক্তিগত প্রগতি ঘটানোর মতো যথেষ্ট ও অর্থপূর্ণ পুঁজি সঞ্চয়ের জন্য একটি পদ্ধতি থাকা দরকার যার মাধ্যমে প্রতিটি গৃহস্তের সঞ্চিত পুঁজি একত্রিত করে একখানে সমবেত করা যায়। এইরূপ একটি পদ্ধতি মোতাবেক তাঁতকাজের সূতা ও ঋণ সরবরাহকারী মহাজনগোষ্ঠী তাঁতীদের চাকরীতে বহাল করে ফেলতে পারে (আমরা জানি এটাই একমাত্র পথ নয়)। মনে করা যাক এই মহাজনগোষ্ঠীর অধীনে এক হাজার তাঁতীকে নিযুক্ত করা হলো। এতে করে মহাজনগোষ্ঠী ৩ থেকে ৫ বছরে ৪/৫ হাজার মার্কিন ডলার বাড়তি সঞ্চয় হাতে পাবে যা ব্যয় করে তারা কয়েকটি স্বয়ংক্রিয় তাঁতযন্ত্র কিনতে পারবে। এর মধ্যমে মহাজনগোষ্ঠী তাঁত-বুনন প্রযুক্তির একটি নতুন ধাপে অনুপ্রবেশ করতে পারবে এবং উৎপাদনশীলতা ত্বরান্বিত গতিতে বৃদ্ধি পাবে।

এখানে এর থেকেও গুরুত্বপূর্ণ যে-বিষয়টি লক্ষ্য করতে হবে তা হলো, উৎপাদনের এই স্বয়ংক্রিয়তা স্বয়ংক্রিয় তাঁতের মতো স্বদেশী কারখানায় নির্মিত যন্ত্রাদির চাহিদা সৃষ্টি করবে। একথা অনেকেই জানেন যে, স্থানীয় স্বয়ংক্রিয় তাঁত নির্মাতারা, যেমন, ধোলাইখাল অঞ্চলের প্রায় ৫০/৬০টি স্বয়ংক্রিয় তাঁত নির্মাণ কারখানা মালিকগণ স্থানীয় বাজারে টিকে থাকার জন্য রীতিমতো যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁত-বুনন শিল্পের স্বয়ংক্রিয়করণ এঁদের সফলতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য। তাঁত-শিল্পের উদাহরণটি যে-কোনো উন্নয়নশীল দেশের অন্য সব সেক্টরের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য হবে।

তৃণমূল পর্যায়ে এনজিও হস্তক্ষেপের কারণে দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার উপর আরো অন্য ধরণের অবাঞ্ছিত পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে। তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক-মনা ও পরিবেশবাদী দলগুলি কিছু কিছু এনজিও-র কার্যকলাপকে সুনজরে দেখে। এরা ভাবে, দেশের সরকার যেখানে গ্রামীণ দরিদ্রকে সাহায্য করতে ব্যর্থ হয়েছে, সেখানে এনজিও-রা সফল হয়েছে এবং হচ্ছে। এরা আরো ভাবে, এই কার্যকলাপ গ্রামবাংলায় অধিকতর সুষম আয় বণ্টনে সহায়তা করছে। এনজিও-দের কার্যকলাপ চূড়ান্ত শিল্পায়নের উদ্যোগ প্রতিহত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। তাই পরিবেশবাদীরা এই কার্যকলাপকে অনেক সময় ভুলবশতঃ পরিবেশ প্রতিরক্ষার অনুকূল বলে চিহ্নিত করে। অসংখ্য উন্নয়নশীল দেশের জন্য এ হচ্ছে অদৃষ্টের একটি পরিহাস

এবং ভাগ্যের চূড়ান্ত এক মারপ্যাচ। উপরে দেখানো হয়েছে, এনজিও-দের কার্যকলাপ আর যা-ই হোক, প্রগতিশীল নয়। প্রকৃতপ্রস্তাবে এগুলি প্রগতিবিরুদ্ধ।

উন্নয়নশীল দেশের তথাকথিত অনেক সমাজতন্ত্রী দল ভুলবশতঃ সমাজতন্ত্রকে (ক) গরীব মানুষের জন্য, (খ) সুষম আয় বণ্টনের জন্য এবং কখনো কখনো (গ) কৃচ্ছ্রসাধনার জন্য ডিজাইন-করা একটি সমাজব্যবস্থা বলে মনে করে। কিন্তু কার্ল মার্ক্সের প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক তত্ত্বের সাথে এই ধারণার কোন মিল নেই। মার্ক্সের তত্ত্ব অনুসারে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার অগ্রগতি হতে হতে এমন এক পরিপক্ক অবস্থায় গিয়ে পৌঁছাবে যখন এটি একটি উপযোগী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসাবে আর টিকে থাকতে পারবে না এবং তখনই সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার উদ্ভব হবে।

কার্ল মার্ক্সের রাজনৈতিক অর্থনীতি তত্ত্বের অন্তরস্ত বৈজ্ঞানিক চিন্তার সারকথা নিম্নলিখিত উপায়ে উপস্থাপনা করা যেতে পারে :

(ক) মূল্য সব সময় সংরক্ষিত থাকে - উৎপাদন-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মূল্য সৃষ্টি করাও সম্ভব নয়, আবার বিনাশ করাও সম্ভব নয়। অর্থাৎ তাপগতিবিদ্যার প্রথম সূত্রের মতো এক্ষেত্রেও ‘শূন্য’ থেকে কোনো কিছু পয়দা করা যায় না। উৎপাদন কাজে যেসব উপাদান লাগে তা মোটের উপর দুই ভাগে ভাগ করা যাবে - মানব শ্রম (দৈহিক বা মানসিক) এবং ধ্রুব পুঁজি। মানব শ্রম (বা পরিবর্তনশীল পুঁজি) এবং ধ্রুব পুঁজির মান দুটিকে যথাক্রমে ‘ম’ এবং ‘ধ’ প্রতীক দিয়ে চিহ্নিত করা যাক। সুতরাং মালিকের মোট ব্যয় হবে ‘ক = ম + ধ’। মুনাফা আসে বাড়তি বা উদ্বৃত্ত মানব শ্রমের (বাড়তি বা উদ্বৃত্ত মূল্য ‘ব’ প্রতীক দিয়ে চিহ্নিত করা যাক) মূল্য থেকে যা ‘ম’ দ্বারা প্রকাশিত মূল্য থেকে আলাদা ও বাড়তি মানব শ্রম। এ যুগে প্রায় সব কোম্পানীই আয়ের একটি পরিমাপ ব্যবহার করে যাকে বলা হয় ‘কর্মচারীপ্রতি বার্ষিক আয়’।

ধরা যাক একটি কোম্পানীতে ১,০০০ জন কর্মচারী নিযুক্ত রয়েছে এবং কোনো একটি বছরে কর্মচারীপ্রতি আয় হয়েছে ১৫০,০০০ মার্কিন ডলার ($)। কর্মচারীপ্রতি গড় বার্ষিক বেতন ধরা যাক $৫০,০০০। তাহলে ম = $৫০,০০০,০০০ (= $৫০,০০০ X ১,০০০)। ধরা যাক প্রতিটি কর্মচারী গড়ে যে-পরিমাণ ধ্রুব পুঁজি প্রক্রিয়াজাত করতে পারে তার মান $৫০,০০০। তাহলে ধ = $৫০,০০০,০০০ (= $৫০,০০০ X ১,০০০)। মোট উদ্বৃত্ত মূল্য ব = $৫০,০০০,০০০ (= $১৫০,০০০ X ১,০০০ - $৫০,০০০ X ১,০০০ - $৫০,০০০ X ১,০০০)। সুতরাং উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত উপাদানের প্রকৃত পরিমাণ হচ্ছে ‘খ = (ম + ব + ধ)’। মূল্যের অবিনশ্বরতার সূত্র অনুসারে মোট উৎপাদিত পণ্যের মূল্যও হবে ঠিক একই পরিমাণ। উদ্বৃত্ত মূল্যের পরিমাণ ‘ব’ মালিকের আয়-ব্যয় হিসাবের খাতায় দেখা দেয় না এবং ফলতঃ তা অদৃশ্য থেকে যায়। মুনাফার হার ‘ল’ এভাবে হিসাব করা যাবে :

ল = ব / (ধ + ম) = (ব/ধ) X {১ / (১ + ম/ধ)} = ব্ X (ম/ধ) X {১ / (১ + ম/ধ)}

এখানে ব্ = উদ্বৃত্ত মূল্যের হার = ব/ম ।

(খ) উপরের ফর্মূলা দেখে ঘাবড়ানোর কোন কারণ নেয়। আসলে এর পিছনের ঘটনাটি খুব সহজে খুলে বলা যাবে। ‘ম/ধ’ অনুপাতটি দিয়ে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা (অনুপাতটি কম্‌লে উৎপাদনশীলতা বাড়ে), অথবা উৎপাদন-প্রক্রিয়ার স্বয়ংক্রিয়তার মাত্রা, অথবা সমাজের প্রযুক্তিগত অগ্রগতির মাত্রা পরিমাপ করা যাবে। পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থাতে প্রচণ্ড প্রতিযোগিতা বিরাজমান থাকার কারণে ক্রমবর্ধমান ধ্রুব পুঁজি (ধ) প্রক্রিয়াজাত করার কাজে ক্রমশঃহ্রাসমান শ্রম (ম) ব্যবহৃত হচ্ছে। এই প্রক্রিয়ার অপর নাম হচ্ছে সমাজ বা উৎপাদন ব্যবস্থার প্রযুক্তিগত অগ্রগতি। এই প্রক্রিয়া নৈর্ব্যক্তিক ও গতিশীল এবং এর গতি মূলতঃ আমাদের

নিয়ন্ত্রনের বাইরে। এই গতি থামানো সম্ভব নয়। বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ এদাম স্মিথ একে ‘অদৃশ্য হাত’ নামে অভিহিত করেছেন।

এর ফলে মুনাফার হার (ল) পতনের প্রবণতা তৈরী হয়। বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশগুলিতে এই প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে এবং সবচেয়ে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতেও তা বস্তুতঃ প্রাথমিক পর্যায়ে রয়ে গিয়েছে - বেশী দূর অগ্রসর হয় নি। প্রক্রিয়াটি সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে পরিপক্কতা লাভ করলে মুনাফার হার কমে এমন এক পর্যায়ে আসবে যেখানে বর্তমান পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অকার্যকর ও অচল হয়ে পড়বে। বুঝতে হবে, এই তত্ত্ব অনুসারে অর্থনীতিকে এই পর্যায়ে আনার কাজে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে অবিরামভাবে অগ্রসরমান ‘প্রযুক্তিগত অগ্রগতি’ - কারণ শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর কাজ কখনো থেমে থাকতে পারে না। এটাই হলো পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা সমালোচনার মার্ক্সীয় সংস্করণের মূল বাণী। এই অপ্রতিরুদ্ধ সম্মুখ গতি ভবিষ্যতের একটি নতুন অর্থনীতি ও সমাজ ব্যবস্থার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বের অনেক শিল্প-অনুন্নত দেশ ঔপনিবেশিক শক্তির হাত থেকে স্বাধীনতা অর্জন করে। অনেকগুলি সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশ ‘‘তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব’’-এর সাথে জড়িয়ে পড়ে। ‘‘তথাকথিত’’ বলা হচ্ছে কারণ আমরা উপরের মার্ক্সীয় বিশ্লেষণ থেকে দেখেছি এগুলি সমাজতান্ত্রিক বিল্পব হওয়া সম্ভব নয়। আসলে এগুলি প্রকৃতপক্ষে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন ছিল না, ছিল সমাজতন্ত্রিক আন্দোলনের ছদ্মবেশে আবৃত জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কারণ বোঝা খুবই সহজ। রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেলেও এই দেশগুলির অর্থনীতি ঔপনিবেশিক শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিল।

প্রাক্তন শিল্পোন্নত ঔপনিবেশিক শক্তিগুলি তখন ঐসব দেশের মাটিতে সশরীরে উপস্থিত না থাকলেও (১) এসব দেশ থেকে যাতে কাঁচামালের প্রবাহ অব্যাহত থাকে এবং (২) এই প্রাক্তন উপনিবেশগুলি যাতে তাদের শিল্পোৎপাদিত পণ্যের বাজার হিসাবে কাজ করে তা নিশ্চিত করে রেখেছিল। তথাকথিক সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, অর্থাৎ ছদ্মবেশে আবৃত জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ছিল এই উন্নতিবিমুখ সম্পর্ক ছেদ করার প্রচেষ্টা মাত্র। এই অর্থে, যে-নামেই আখ্যায়িত করা হোক না কেন, এই আন্দোলনের ঐতিহাসিক ও প্রগতিশীল ভূমিকাটিকে গুরত্বহীন বলে ছুড়ে ফেলা যাবে না। তবে এনজিও-রা প্রণালীবদ্ধভাবে পুঁজি বিক্ষিপ্ত করা, অর্থাৎ পুঁজি সঞ্চয় হতে বাধা দেবার যে-কাজ করছে তাকে সমাজতান্ত্রিক বা প্রগতিশীল বলে আখ্যায়িত করা উন্নয়নশীল দেশগুলির জন্য হবে ধংসাত্মক।

বাংলাদেশের কিছু কিছু এনজিও ওষুধ তৈরী, সিন্থেটিক রসায়নিক দ্রব্য দ্বারা প্রস্তুত চেয়ার, বাথরুম আসবাব নির্মাণ, ইত্যাদি কাজে জড়িত আছে। কাছ থেকে পরীক্ষা করলে খুব সহজেই দেখা যাবে, এই এনজিও-গুলি তাদের অর্থ-যোগানদারী শিল্পোন্নত দেশ থেকে আমদানীকৃত ‘‘উচ্চমূল্যের অন্তর্বর্তীকালীন’’ দ্রব্য সংযোজন করে মাত্র। এই ধরণের কার্যকলাপ একই সাথে ‘ক্যাপিটাল গুড্‌স্’-এর চাদিহা সৃষ্টি করে। এগুলিও ঐসব দাতা দেশগুলি থেকে আমদানী করা হয়।

ফলে অত্যাধুনিক গবেষণা ও উচ্চপর্যায়ের বুদ্ধিজীবী কার্যকলাপ দেশের বাইরে সংঘটিত হচ্ছে এবং কেবল নিচুপর্যায়ের কায়িক শ্রমের কাজ আতিথ্যকারী উন্নয়নশীল দেশের কর্মীদের দিয়ে করিয়ে নেবার জন্য থেকে যাচ্ছে। আমরা এখনো অপেক্ষা করে আছি কবে দেখবো প্রথম একজন ডক্টরেট ডিগ্রীধারী বাংলাদেশী তার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্জিত মূল প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা সরাসরি কাজে লাগিয়ে স্বদেশে উৎপাদনকাজে নিয়োজিত হয়েছে। যতদিন স্বদেশী ডক্টরেট ডিগ্রীধারী বুদ্ধিজীবীদের মানসিক শ্রম স্থানীয় উচ্চমূল্যের পণ্যদ্রব্য উৎপাদনে কাজে না লাগে ততদিন পর্যন্ত কোন দেশের মাটিতেই আর্থসামাজিক উন্নয়ন অথবা প্রযুক্তিগত

অগ্রগতির শেকড় গাড়বে না।

এ-বিষয়ে আবু আবদুল্লাহ সাহেবের ১৯৯১ সনে লিখিত ‘‘মর্ডানাইজেশন এট বে : স্ট্রাকচার এণ্ড চেঞ্জ ইন বাংলাদেশ’’ বই থেকে কিছু উদ্ধৃতি এখানে তুলে দেওয়া প্রাসঙ্গিক হবে। আমার মতে এই বইটিতে বাংলাদেশ আধুনিকীকরণ সমস্যার সত্যিকার চিত্রটি সঠিকভাবে তুলে ধরা হয়েছে -

‘‘কারিগরী অগ্রগতির অভাব কেবল অর্থনৈতিক নিশ্চলতা নয়, বরং বুদ্ধিজীবী নিশ্চলতার লক্ষণ ও কারণও বটে। প্রযুক্তির অগ্রগতি মানব-শ্রমের মানবতা ও দক্ষতা হরণ করে - এ নিয়ে অনেক কথাই বলা হয়েছে, কিন্তু আমাদের কাছে মনে হয়েছে, এ-ধারণা অনেক সময় ঐতিহ্যবাহী সনাতন শ্রম প্রক্রিয়ার ধরণকে একটি আবেগপ্রবণ, রোমান্টিক এবং সম্পূর্ণ ভুল দৃষ্টিতে দেখার উপর ভিত্তি করে তৈরী। .... শ্রম-উৎপাদনশীলতার ক্রমাগত প্রবৃদ্ধিই কেবল মজুরির ক্রমাগত প্রবৃদ্ধিকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে। তদুপরি, বিভিন্ন কারিগরী বিষয়ে শিক্ষা-প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা ও এর শিল্প-প্রতিষ্ঠানিক প্রয়োগ - এই দুয়ের মধ্যে নিকট যোগাযোগের অভাবে উভয়ই জ্বরাগ্রস্ত হয়। .... অধিকাংশ মানুষ বেঁচে থাকার মূল্য নিয়ে ভীষণ সন্দেহবান হবে যদি তাদের গবেষণার ফল কোনো পণ্যদ্রব্য বা প্রক্রিয়াতে অন্তর্ভূক্ত হবার আশা না থাকে .... বাংলাদেশের বর্তমান পরিবেশ-দূষণ সমস্যা কারিগরী অগ্রগতির কারণে সৃষ্টি হয়নি, হয়েছে কারিগরী জ্ঞানের অভাবে, ... (৫৭-৫৮ নং পৃষ্ঠা)। ‘‘দ্রুত শিল্পায়ন কেবল অব্যাহত অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্যই অপরিহার্য নয়, বরং তা নতুন দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও কার্যাভ্যাসের চাহিদা সৃষ্টি ক’রে সমাজের উপর আধুনিকীকরণের একটি প্রভাবও ফেলবে।’’ (১৪২ নং পৃষ্ঠা)।

(৪) তৃতীয় কৌশল

উপরোল্লিখিত প্রতিষ্ঠানগুলি ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক (ডব্লিউ-বি) এবং ইন্টারন্যাশনাল মোনেটরী ফাণ্ড (আই-এম-এফ)-এর মতো অর্থ-যোগানদারী প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের উপর এমন এক ধরণের শুল্ককাঠামো চাপিয়ে দেয় যা স্থানীয়ভাবে উচ্চমূল্য পণ্য উৎপাদনের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। উদাহরণস্বরূপ, আমদানীকৃত উচ্চমূল্য কারখানা-নির্মিত পণ্যদ্রব্যের উপর নামমাত্র ২.৫% আমদানী শুল্ক বসানো হয়। অপরপক্ষে, এইসব উচ্চমূল্য পণ্যদ্রব্য স্থানীয়ভাবে উৎপাদন করার জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও উপাদানের উপর বিশাল ৫০% থেকে ১৫০% আমদানী শুল্ক বসিয়ে দেওয়া হয়। এর ফলে স্থানীয় শিল্প-কারখানা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

আপাতঃদৃষ্টিতে যন্ত্রপাতি, ইত্যাদির মতো আমদানীকৃত পণ্যের উপর স্বল্পমাত্রায় আমদানী শুল্ক বসানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বদেশে ভোগ্যপণ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে উৎসাহদান করা। স্থানীয়ভাবে যন্ত্রপাতি নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের উপর অস্বাভাবিকভাবে উঁচু শুল্ক বসানোর একমাত্র কারণ হতে পারে সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করা। আমরা বলেছি, প্রকৃত অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটানোর জন্য স্বদেশে যন্ত্রসহ উচ্চমূল্য পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের ক্ষমতা অর্জন করতে হবে। সে-কারণে আমদানীকৃত যন্ত্রপাতি এবং কাঁচামালের উপর বসানো বর্তমান শুল্কের হার নিঃসন্দেহে প্রগতিবিরুদ্ধ।

এই ধরণের শুল্ককাঠামো অনেক সময় বিদেশী অর্থ-সাহায্যে পরিচালিত প্রকল্পের মাধ্যমে সংস্থাপিত হয়। বাংলাদেশের মতো সাহায্য-গ্রহীতা দেশ এইরূপ শুল্ককাঠামো বসাতে রাজী না হলে সাহায্যদাতা দেশ অর্থ-সাহায্য কর্মসূচী বাতিল করে দেবার জন্য সরাসরি হুমকি দেয়। হুমকি কার্যকর হলে গ্রহীতা দেশের অর্থনীতি ভারসাম্য হারিয়ে ফেলতে পারে এবং ফলতঃ লক্ষ-কোটি মানুষ দুরবস্থার মধ্যে পড়ে যেতে পারে।

আন্তর্জাতিক উন্নয়ন ও অর্থ-যোগানী প্রতিষ্ঠানগুলি স্বভাবতঃই বোঝানোর চেষ্টা করে যে, বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশ মূলতঃ সরবরাহ সমস্যায় আক্রান্ত, চাহিদা সমস্যা নয়। কিন্তু সত্য ঘটনাটি এর সম্পূর্ণ বিপরীত এবং তা অর্থনীতির সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রনির্মাণ সেক্টরের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সত্যি। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন মূলতঃ একটি চাহিদা সমস্যা, সরবরাহ সমস্যা নয়। উদাহরণস্বরূপ, ধরা যাক মুক্তবাজার অর্থনীতির বাহানায় একটি ন্যায্য শুল্ককাঠামো প্রতিষ্ঠা করা হলো এবং তাতে মোটা অংকের স্থানীয় চাহিদা স্থানীয় নির্মাতাদের জন্য উন্মুক্ত হলো। এই পরিস্থিতিতে ক্রমবর্ধমান চাহিদা অব্যর্থভাবে পূরণের জন্য বাংলাদেশের অর্থনীতিতে যথেষ্ঠ উৎপাদন ক্ষমতা বর্তমান রয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরো ক্ষমতা অর্জন করার সুযোগ সুপ্ত অবস্থায় রয়েছে।